Vol. 27 | No. 2 | 1984

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জীবনানন্দ দাশ : তিমির হননে

Volume	27
Issue	2
Year	1984
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
Published online	April 1, 1984
DOI	10.62328/sp.vi.406
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.vi.406
Pages	1-34
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Check for updates

জীবনানন্দ দাশ : তিমির হননে

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) এসেছেন পূর্বসূরি কবিদের হাত ধরে। তাঁর কবি-জীবনের প্রথম পর্যায়ে—'ঝরা পালক'-এ (১৩৩৪)—যদিও আছেন সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল মূলতঃ ছন্দ-প্রতিধ্বনিতে, তবু প্রধানতঃ ঐ কালে তাঁর বক্তব্যে যে-আশাবাদ এবং শব্দ-ব্যবহারে যে-মিশ্র সংস্কৃতির বাস্তবতার স্বীকৃতি, সেখানে বিশেষ-ভাবে উপস্থিত প্রেমিক ও মানবতাবাদী কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

প্রস্তুতি-পর্বে নানা স্বরের সাধনার স্বপক্ষে ডিলান টমাস এক সাক্ষাৎকারে (১৯৫১) বলেছিলেন :

> I tried my callow hand at almost every poetical form. How could I learn the tricks of a trade unless I tried to do them myself ? I learned that the bad tricks come easily; and the good ones, which help you to say what you think you wish to say in the most meaningful, moving way, I am still learning.[১]

এই নানা সুরের সাধনাই একজন প্রকৃত কবির প্রস্তুতি পর্বের নীরব কাজ। সংস্কৃত সাহিত্য, বৈষ্ণব কবিতা, বাউল গান, বিহারীলাল ও মধুসূদনের নিকট সুস্পষ্ট ঋণ রবীন্দ্রনাথকে ভিত্তি দিয়েছে আত্মানুসন্ধানের এবং স্বকণ্ঠের সন্ধান পেয়েও রবীন্দ্রনাথ আজীবন নিজেকে পরিবর্তন করে গেছেন। তাই মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অসামান্য তারুণ্যের দীপ্তি ছিল তাঁর; বার্ধক্য দেহকে নিয়েছে, কিন্তু কবিকণ্ঠে স্পর্শ করেনি জরা।

জীবনানন্দ দাশের এই নীরব কাজের পর্যায় পরিচিহ্নিত তাঁর 'ঝরা পালক'। পূর্বসূরির ঋণ অকপট জড়িয়ে আছে এর স্তবকগুচ্ছে, চরণে চরণে। যেটা লক্ষণীয় তা হচ্ছে, স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ব্যবহারে কবির অনায়াস দক্ষতা এবং আরবী-ফারসী শব্দ-ব্যবহারের বিশিষ্ট প্রবণতা। উল্লেখ করা প্রয়োজন, মোহিতলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে মুসলিম-প্রসঙ্গ উপস্থাপন সূত্রে। এ-দিক দিয়ে তাঁরা ভারতচন্দ্রানুসারী। ভারতচন্দ্রই প্রথম মুসলিম-প্রসঙ্গ বর্ণনায় সচেতনভাবে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেন এবং কৈফিয়ৎ দেন : "যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে"।[২] নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা'র (১৯২২) কবিতায়ও মুসলিম-প্রসঙ্গে আরবী-ফারসী শব্দ ও হিন্দু-প্রসঙ্গে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগবাহুল্য আছে। তবে নজরুল ইসলামই প্রথম

বিষয়-নির্বিশেষে আধুনিক কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দ-ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্য প্রদর্শন করেন। 'ঝরা পালক'-এ জীবনানন্দ বিষয়-নির্বিশেষে আরবী-ফারসী শব্দ-ব্যবহারের নজরুল-প্রতিষ্ঠিত এই আদর্শানুসারী। যেমন :

১. আমি কবি,—সেই কবি,—
আকাশে কাতর আঁখি তুলি' হেরি ঝরা পালকের ছবি!
... ...
স্বপন সুরার ঘোরে

আখের ভুলিয়া আপনারে আমি রেখেছি দিওয়ানা ক'রে'!
জনম ভরিয়া সে কোন্ হেঁয়ালি হ'লো না আমার সাধা,—
পায় পায় নাচে জিঞ্জির হায়,—পথে পথে ধায় ধাঁধা!
—নিমেষে পাসরি' এই বসুধার নিয়তি মানার বাধা
সারাটি জীবন খেয়ালের খোশে পেয়ালা রেখেছি ভরে'!
("আমি কবি,—সেই কবি," কাব্য সম্ভার, পৃ. ৩৫৭)

২. কে যেন রেখেছে সবুজ ঘাসের কোমল গালিচা পাতি!
যত খুন যত খারাবীর ঘোরে পরাণ আছিল মাতি,'
নিমেষে গিয়েছে ভেঙে
স্বপন-আবেশে রেঙে
আঁখি দুটি তার জৌলস্-রাঙা হ'য়ে গেছে রাতারাতি।
... ...
বিলায়ে দিয়েছে বাঙা নার্গিস কালো পশ্‌মিনা চুলে!
বসেছে বালিকা খর্জ্জুরছায়ে নীল দরিয়ার কূলে।
("মরীচিকার পিছে", কাব্য সম্ভার, পৃ. ৩৬৪-৬৫)

৩. আখেরের ভয় ভুলে'
দিলাওয়ার প্রাণ খুলে'
জীবন-রবাবে টানিছে ক্ষিপ্ত ছড়ি।
... ...
সারাটি নিশীথ খুন্-রোশ্‌নাই প্রদীপে মনটি রেঙে
একাকী রয়েছি বসি',
নিরালা গগনে কখন নিভেছে শশী
পাইনি যে তাহা টের!
—দূর দিগন্তে চলে গেছে কোথা খুশ্‌রোজী মুসাফের!
কোন সুদূরের তুরাণী প্রিয়ার তরে
বুকের ডাকাত আজিও আমার জিঞ্জিরে কেঁদে মরে!

দীর্ঘ দিবস ব'য়ে গেছে যারা হাসি অশ্রুর বোঝা
চাঁদের আলোকে ভেঙেছে তাদের 'রোজা';
আমার গগনে 'ঈদরাত' কভু দেয়নি যে হায় দেখা,
পরাণে কখনো জাগেনি 'রোজা'র ঠেকা

... ...

এই যে তৃষ্ণা-দৈন্য-দুরাশা-জয়সংগ্রাম-ভুল
সফেন সুরার ঝাঁঝের মতন ক'রে দেয় মজ্‌গুল
দিওয়ানা প্রাণের নেশা!
ভগবান,—ভগবান,—তুমি যুগ যুগ থেকে ধ'রেছ শুঁড়ির পেশা!

... ...

অনাদি কালের থেকে;
মরণশিয়রে মাথা পেতে' তার দস্তুর যাই দেখে!
("জীবন-মরণ দুয়ারে আমার", কাব্য সম্ভার, পৃ. ৩৬৬-৬৮)

৪. আমি খুশ্‌রোজী,—আমি গো খেয়ালী,
চঞ্চল, চুল্‌বুল্‌
("যে কামনা নিয়ে", কাব্য সম্ভার, পৃ. ৪২৩)

স্বরবৃত্তেও নজরুলের সুপরিচিত আবহের প্রতিধ্বনি বেজে ওঠে :

১. দুপুর রাতে ও কার আওয়াজ!
গান কে গাহে,—গান না!
কপোতবধূ ঘুমিয়ে আছে
নিঝুম ঝিঁঝির বুকের কাছে;
অস্তচাঁদের আলোর তলে
এ কার তবে কান্না!
গান কে গাহে—গান না!
("ছায়া প্রিয়া", কাব্য সম্ভার, পৃ. ৩৮৮)

২. গড়্‌তে যাবে যারা তোদের বুকের মাঝে বাসা
হাড্ডি তাদের ফোঁফ্‌রা হ'য়ে ঝুরবে বালুর মাঝে,
এইখানেতে নেইক' দরদ,—নেইক' ভালোবাসা,
বর্শা লাফায়,—উটের গলায় ঘুণ্টি শুধু বাজে!
ফুরিয়ে গেছে আশা যাদের,—জুড়িয়ে গেছে জ্বালা,
আয় রে বালুর 'কারবালা'তে, অন্ধকারের ঝাঁঝে!
("মরুবালু", কাব্য সম্ভার, পৃ. ৪১৮)

এ-গ্রন্থের "হিন্দু-মুসলমান", "নিখিল আমার ভাই" ও "বিবেকানন্দ" কবিতায় যুগের বাণী পূর্বসূরিদের ভঙ্গিতেই উপস্থাপিত :

১. মহামৈত্রীর বরদ-তীর্থে—পুণ্য ভারতপুরে
পূজার ঘণ্টা মিশিছে হরষে নামাজের সুরে সুরে!
আহ্নিক হেথা সুরু হয়ে যায় আজান বেলার মাঝে,
মুয়াজ্জেনদের উদাস ধ্বনিটি গগনে গগনে বাজে;
জাগে ঈদগাতে তসবী ফকির, পূজারী মন্ত্র পড়ে,
সন্ধ্যা-উষার বেদবাণী যায় মিশে কোরানের সুরে;
সন্ন্যাসী আর পীর
মিলে গেছে হেথা—মিশে গেছে হেথা মসজিদ, মন্দির!
("হিন্দু মুসলমান", কাব্য সম্ভার, পৃ. ৪০২)

২. নিখিল আমার ভাই,
—কীটের বুকেতে যেই ব্যথা জাগে আমি সে বেদনা পাই;

... ...

লভিয়াছে বুঝি ঠাঁই
আমার চোখের অশ্রুপুঞ্জে নিখিলের বোন ভাই!
আমার গানেতে জাগিছে তাদের বেদনাপীড়ার দান,
আমার প্রাণেতে জাগিছে তাদের নিপীড়িত ভগবান,
আমার হৃদয়-যূপেতে তাহারা করিছে রক্তস্নান,
আমার মনের চিতানলে জ্বলে লুটায়ে যেতেছে ছাই!
আমার চোখের অশ্রুপুঞ্জে লভিয়াছে তারা ঠাঁই।
("নিখিল আমার ভাই", কাব্য সম্ভার, পৃ. ৪০৫)

৩. জয়,—তরুণের জয়!
জয় পুরোহিত আহিতাগ্নিক,—জয়,—জয় চিন্ময়!

... ...

হে প্রেমিক মহাজন,
তোমার পানেতে তাকাইল কোটি দরিদ্র-নারায়ণ;
অনাথের বেশে ভগবান এসে তোমার তোরণতলে
বারবার যবে কেঁদে কেঁদে গেল কাতর আঁখির জলে,
অর্পিলে তব প্রীতি-উপায়ন প্রাণের কুসুমদলে!
("বিবেকানন্দ", কাব্য সম্ভার, পৃ. ৪০০-০১)

তবে 'ঝরা পালক' পর্যায়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উচ্চারণ লক্ষ্য করি নজরুল-অনুসারী "নব নবীনের লাগি" কবিতায় :

—নব নবীনের লাগি
প্রদীপ ধরিয়া আঁধারের বুকে আমরা রয়েছি জাগি'!
ব্যর্থ পঙ্গু খর্ব্ব প্রাণের বিকল শাসন ভেঙে,
নব আকাঙ্ক্ষা আশার স্বপনে হৃদয় মোদের রেঙে,
দেবতার দ্বারে নবীন বিধান—নতুন ভিক্ষা মেগে
দাঁড়ায়েছি মোরা তরুণ প্রাণের অরুণের অনুরাগী!

. . .　　. . .　　. . .

গাহি মানবের জয়!
—কোটি কোটি বুকে কোটি ভগবান আঁখি মেলে জেগে রয়!
সবার প্রাণের অশ্রু-বেদনা মোদের বক্ষে লাগে,
কোটি বুকে কোটি দেউটি জ্বলিছে,—কোটি কোটি শিখা জাগে,
প্রদীপনিভারে মানব-দেবের দেউল যাহারা ভাঙে,
আমরা তাদের শস্ত্র, শাসন, আসন করিব ক্ষয়!
—জয় মানবের জয়!

(কাব্য সম্ভার, পৃ. ৩৫৯-৬০)

মানবের জয়গানের এই উচ্চারণ নজরুল-অনুসারী হলেও, তা জীবনানন্দের প্রস্তুতিপর্বের কবিতার উপসংহার। বিশ্বাসের এই উচ্চারণ জীবনানন্দের পরিণত কবিমানসের চূড়ান্ত পর্যায়কে উপলব্ধির জন্য গুরুত্ব বহন করে।

'ঝরা পালকে'ই জীবনানন্দ খুঁজে পাচ্ছেন তাঁর স্বতন্ত্র পথচিহ্ন। নজরুলকে ছুঁয়েই অলক্ষ্য বন্দর পানে ছুটে যাচ্ছেন "জল-বেদিয়া', 'সিন্ধু বেদুইন' :

কোন দূর কুহকের কূল
লক্ষ্য করি ছুটিতেছে নাবিকের হৃদয়-মাস্তুল
কেবা তাহা জানে!
অচিন আকাশ তারে কোন্ কথা কয় কানে কানে।

("নাবিক", কাব্য সম্ভার, পৃ. ৩৭৪)

এবং "অস্তচাঁদে" কবিতার দীর্ঘপংক্তি ও মিত্র ছন্দে বহু প্রাচীন সভ্যতায় পরিক্রমা—

দূর উর—ব্যাবিলোন্—মিশরের মরুভূ-সঙ্কটে,
কোথা পিরামিড্‌তলে—ঈসিসের বেদিকার মূলে,

(কাব্য সম্ভার, পৃ. ৩৮৬)

কবি নিয়েছেন 'আসীরীয় সম্রাটের বেশ' :

১. 'আমি ছিনু 'ক্রবেদুর' কোন্ দূর 'প্রভেন্স্ প্রান্তরে!'
২. 'অলিভ্-পাতার ফাঁকে চূর্ণচোখে চেয়েছিল চাঁদ',
৩. 'স্পেইনের সিয়োরা'য় ছিনু আমি দস্যু,—অশ্বারোহী',—

(কাব্য সম্ভার, পৃ. ৩৮৭)

বহু সভ্যতা ও বহু কাল-পরিক্রমার উপসংহারে কবির মনে পড়ছে :

বাংলার মাঠে ঘাটে ফিরেছিনু বেণু হাতে একা,
গঙ্গার তীরে কবে কার সাথে হ'য়েছিল দেখা।

(কাব্য সম্ভার, পৃ. ৩৮৭)

সন্দেহ নেই, এই [illegible] পরবর্তী কাব্যসমূহে শোনাবেন স্বকণ্ঠের গান।

২

"কবিতার কথা" প্রবন্ধে বহুল উদ্ধৃত বাক্যটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে :

সকলেই কবি নয়; কেউ কেউ কবি; কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে।[৩]

উচ্চারিত প্রতিটি প্রসঙ্গ—(১) কল্পনা-চিন্তা-অভিজ্ঞতা, (২) অনেক বিগত শতাব্দীর পৃথিবীর উত্তরাধিকার এবং (৩) সমকালীন বিশ্ব-কাব্যমণ্ডলের নব নব কাব্যবিকীরণ—জীবনানন্দ দাশকে আধুনিক কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশে সাহায্য করেছে। তাই 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকায় নিজের কবিতা সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচকের নানা অভিমতের সীমাবদ্ধতা তিনি অনায়াসে চিহ্নিত করেছেন :

আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে; কেউ বলেছেন, এ-কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজচেতনার, অন্যমনে নিশ্চেতনার; কারো মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার; সুরিয়ালিস্ট। আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য—কোন কোন কবিতা বা কাব্যের কোন কোন অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।[৪]

সৎ কবি মাত্রেরই এই প্রত্যাশা যে, সমগ্রভাবে দেখা হবে তাঁর কবিতা।

৩

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র যে-বিশ্বমনস্কতা তার পরোক্ষ অনুপ্রেরণায় আছেন লরেন্স, ইয়েটস, পাউন্ড ও এলিয়ট। লরেন্সের "ক্যাঙ্গারু"তে অস্ট্রেলিয়ার এবং "স্নেক" সিসিলির ভূদৃশ্য পটভূমি দিচ্ছে; পাউন্ডের বিশ্ব ঐতিহ্যগ্রাহী চৈতন্য---এমনকি চৈনিক কাব্যানুবাদ, এলিয়টের 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ডে' উপনিষদ-স্মরণ বিশ দশকের ইংরেজী কবিতায় ইওরোপ ছাড়িয়ে গেছে আধুনিক কবির দৃষ্টিভঙ্গি। এলিয়েটের 'Gerontion'-এর কিছু চরণ :

To be eaten, to be divided, to be drunk
Among whispers ; by Mr. Silvero
with caressing hands, at Limoges
who walked all night in the next room;
By Hakagawa, bowing among the Titians;
By Madame de Tornquist, in the dark room
Shifting the candles ; Fraulein von kulp
who turned in the hall, one hand on the door.[৫]

উচ্চারিত নামসমূহ বিচিত্র বিদেশী; কবি শুধু ইওরোপীয় নয় আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়াচ্ছেন। এই অভিজ্ঞতা সকল সংস্কৃতি, সকল ইতিহাস ছুঁয়ে যাচ্ছে। এলিয়টের বিভিন্ন কবিতায় প্রাচীন মিশর, বৌদ্ধমন্ত্র, প্রাচীন গ্রীস, টাইটিয়ান ইত্যাদি বিচিত্র দেশ-সংস্কৃতি-অতীত-বর্তমান বিমিশ্র হয়ে আছে।

এলিয়ট-অনুপ্রাণিত এই বিশ্বসংস্কৃতির বহুকালের যাত্রায় নাবিক জীবনানন্দ পাড়ি দেন বহু পথ। 'হাজার বছর ধরে', 'তিনশো বছর' ধরে, 'পাঁচশো বছর'; 'সাতশ বছর' ইত্যাদি উল্লেখের মধ্যে বহমান জীবনের সামগ্রিক ধারাকে তিনি চিনে নেন। এই জীবন-প্রবাহ রাবীন্দ্রিক 'অনন্ত'-চিহ্নিত নয়, নয় তা কল্যাণাভিসারী। বরং যে-প্রেক্ষাপটে এই যাত্রাশুরু সেখানে প্রকৃতিতে নেই ফসলের সম্ভাবনা; বিশ্বপ্রকৃতি পোড়ো জমি বা ওয়েস্ট ল্যাণ্ড ৬-এ রূপান্তরিত। তাই জীবনানন্দের মনে হয় মানুষের প্রাণ হাজার বছর পথপরিক্রমায় ক্লান্ত এবং সম্ভাবনাহীন।

প্রকৃতির সম্ভাবনাকে মানুষই বিনষ্ট করছে প্রকৃতি-বিজয়ী 'সভ্যতা' সৃষ্টির উন্মাদনায়। বহু প্রাচীন কাল থেকে প্রকৃতি ও সভ্যতার বিরোধ বহু ব্যক্তিকে ভাবিয়েছে, পুনঃ জন্মগ্রহণে প্রাণিত করেছে। যেমন সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মপ্রচারক জন বানইয়ান বলেছেন :

And now I am sorry that God made me man. The beasts, birds, fishes etc., blessed their conditions, for they had no sinful nature. They are not obnoxious to the wrath of God, they are not to go to hell after death.

জীবনানন্দের ভাষায় 'যে-জীবন ফড়িংয়ের, দোয়েলের মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা'। বিংশ শতাব্দীর এক দশক যেতে না যেতেই প্রথম মহাযুদ্ধ বিজ্ঞানের বিধ্বংসী রূপকে সুপ্রত্যক্ষ করেছে। জীবনানন্দের মনে হয়েছে বিজ্ঞানের হাতিয়ার হাতে মানুষের সভ্যতাসৃষ্টির প্রয়াস শুধু 'বেদনার জন্ম দিতে পারে'। বিপরীতে প্রকৃতিতে ঠিক ইয়েটস নয়, রবীন্দ্রনাথ নয়—ভিন্নার্থে জীবনানন্দ অবিনশ্বরতা দেখছেন ; রূপসী বাংলার প্রথম কবিতায় অসামান্য মিতভাষিতায় কবি বলছেন :

সেই দিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি
এই নদী নক্ষত্রের তলে
সেদিনো দেখিবে স্বপ্ন—
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!
("সেই দিন এই মাঠ", কাব্য সম্ভার পৃ. ১০৯)

'সোনার স্বপ্নের সাধ', অর্থাৎ সুপ্রিয় ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা, পৃথিবীতে প্রকৃতিতে চিরকালীন ; তাই ব্যক্তিমানুষ মুখ্য নয় :

আমি চ'লে যাব ব'লে
চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে ?
লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে ?
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!

এই অনুভব রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ উচ্চারণের সঙ্গে তুলনীয় :

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে
আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে
চুকিয়ে দেব বেচা-কেনা
—মিটিয়ে দেব লেনা-দেনা
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে···

তখন এমনি করেই বাজবে বাঁশী এই নাটে
···কাটবে সেদিন আজো যেমন দিন কাটে···
ঘাটে ঘাটে খেয়ার তরী
এমনি সেদিন উঠবে ভরি—
চরবে গোরু খেলবে রাখাল ওই মাঠে।[৭]

জীবনানন্দ অবশ্য ভিন্নতর সিদ্ধান্তসন্ধানী :

চারিদিকে শান্ত বাতি—ভিজে গন্ধ—মৃদু কলরব ;
খেয়ানৌকোগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে ;

পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল ;—
এশিরিয়া ধুলো আজ, বেবিলন ছাই হ'য়ে আছে।
(কাব্য সম্ভার, পৃ. ১০৯)

পৃথিবীর কোন গল্প ? প্রকৃতির গল্প বেঁচে রবে চিরকাল, এবং মানুষ যে-সভ্যতা সৃষ্টি করেছে এশিরিয়া-বেবিলন—তা আজ 'ধুলো' আর 'ছাই'।—এই ভাবে নতুন চোখে জীবনানন্দ তাকাচ্ছেন।

বলাবাহুল্য 'রূপসী বাংলা'র চিত্রাবলী কবি জীবনানন্দ দাশের সমকালের বাংলাদেশ নয় ; এ তাঁর স্বপ্ন ও স্মৃতির নিসর্গ ; রূপসী বাংলা তাই কবির শ্রুতি, স্মৃতি ও স্বপ্নোত্থিত। এমন শান্ত সমাহিত নিরুৎসাহিত ছিলনা তাঁর কালের বাংলাদেশের পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে ব্যক্তিমানুষের সংগ্রামী ছবি হয়ত অনেক পর্যায়েই অসহায়। কিন্তু জীবনানন্দের কাছে প্রকৃতিই সর্বশক্তির আধার। মানুষ যেখানে জেগে ওঠে না কোন কর্মদীপ্তিতে ; প্রকৃতি-সমর্পিত জীবনাকাঙ্ক্ষাই সেখানে প্রবল।

'রূপসী বাংলা'র বহু বিখ্যাত চরণ উচ্চারণ মাত্র সচকিত করে তোলে, যেমন :

তোমরা যেখানে সাধ চ'লে যাও—আমি এই বাংলার পারে
র'য়ে যাব ;
("তোমরা যেখানে সাধ", কাব্য সম্ভার, পৃ. ১০৯)

কিন্তু বিস্ময়কর এই যে, বাংলার পারে বসে কবি কি দেখবেন ? কোনো মানবিক কর্মচাঞ্চল্য নয় :

দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে ;
দেখিব খয়েরী ডানা শালিখের সন্ধ্যায় হিম হ'য়ে আসে

এবং সেই শালিখও ক্ষণকালের প্রাণী—সন্ধ্যায় তার খয়েরী ডানা হিম হয়ে আসাই বাস্তব।

ধবল রোমের নিচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে
নেচে চলে—একবার—দুইবার—তারপর হঠাৎ তাহারে
বনের হিজল গাছ ডাক দিয়ে নিয়ে যায় হৃদয়ের পাশে ;
(কাব্য সম্ভার, পৃ. ১০৯)

প্রকৃতির পাখী একবার দুইবার নেচেই প্রকৃতিতে অনায়াসে বিলীন হয়ে যায় ; সন্ধ্যায় মৃত্যুর হিমে। পরবর্তী কবিতায় :

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর :

—এই অসামান্য উচ্চারণের পর প্রকৃতির নানা উপাদানের তালিকা প্রণীত হয় এবং শেষ ছয় চরণে বেহুলার পুরাণে বাংলার প্রকৃতির সাহচর্যই যে সঞ্জীবনী—এই সিদ্ধান্ত মুখ্য হয়ে ওঠে উপসংহারের অতুলনীয় দুই পংক্তিতে :

ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিলো ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায়।
("বাংলার মুখ আমি", কাব্য সম্ভার, পৃ. ১১০)

কবি একবার বলছেন 'জীবন যে কাটিয়াছে বাংলায়—চারিদিকে বাঙালীর ভিড়' (কাব্য সম্ভার, পৃ. ১১৪), তাই 'রূপহীন প্রবাসের পথ' তাঁর নয় :

কোনদিন রূপহীন প্রবাসের পথে
বাংলার মুখ ভুলে খাঁচার ভিতরে নষ্ট শুকের মতন
কাটাইনি দিন মাস।
("যেদিন সরিয়া যাব", কাব্য সম্ভার, পৃ. ১১৪)

এবং সেই জন্যই সমকালের যন্ত্রময় পৃথিবীর সভ্যতাগর্ব তাঁর নিষ্প্রয়োজন :

পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত কোনখানে সফলতা শক্তির ভিতর,
কোনখানে আকাশের গায়ে রূঢ় মনুমেন্ট উঠিতেছে জেগে,
কোথায় মাস্তুল তুলে জাহাজের ভিড় সব লেগে আছে মেঘে,
জানিনাকো ; আমি এই বাংলার পাড়াগাঁয়ে বাঁধিয়াছি ঘর :
("পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত," কাব্য সম্ভার, পৃ. ১১৪)

পৃথিবীতে পুনর্জন্মের কল্পনায় তিনি বাংলাতেই ফিরে আসতে চান তবে মানুষ হিসেবে নয়, 'শঙ্খচিল শালিখের বেশে', 'ভোরের কাক হয়ে', 'কিশোরীর হাঁস হয়ে', সন্ধ্যায় ওড়া 'সুদর্শন' হয়ে, 'শিমুলের ডালে লক্ষ্মীপেঁচা' হয়ে, 'ধবল বক' হয়ে—অর্থাৎ প্রকৃতির উপাদান হয়ে। মনে পড়েছে উঠানের ঘাসে খই ছড়ানো শিশুর কথা, রূপসার ঘোলা জলে সাদা ছেঁড়া পালে ডিঙা বাওয়া কিশোরের কথা ; হয়ত সেই শিশু সেই কিশোর হয়ে, যে তখনো প্রকৃতির উপাদান ; কিন্তু কখনই প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিজ্ঞান হাতে দাঁড়ানো মানুষ হিসেবে নয় :

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে,
হয়তো ভোরের কাক হ'য়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায় ;
হয়তো বা হাঁস হবো—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধভরা জলে ভেসে-ভেসে ;

আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;
হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে,
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
রূপসার ঘোলা জলে হয়ত কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে;
ডিঙা বায়;—রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে—
("আবার আসিব ফিরে", কাব্য সম্ভার, পৃ. ১১৭)

প্রকৃতি-বিনাশী সভ্যতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে এইভাবে প্রকৃতি-সংলগ্ন জীবনের আকাঙ্ক্ষা করছেন কবি।

এই চেতনারই পরিণাম 'বনলতা সেন' কাব্যের নাম-কবিতা। "বনলতা সেন"-এ দেখি প্রকৃতির সমগ্রতায় লীনতা-প্রত্যাশী কবি 'হাজার বছরের' পথ-পরিক্রমায় ক্লান্ত। জেমস্ জয়েসের 'ইউলিসিস'-এর (১৯২২) ইহুদি লিওপোল্ড ব্লুম-এর অভিযাত্রার কথা স্মরণে আসে; বলাবাহুল্য, পরিণাম ভিন্নমুখী। বিশ্বের সকল কেন্দ্রে এবং সকল ইতিহাসের মধ্যে উপস্থিতির আকাঙ্ক্ষা জীবনানন্দের ক্ষেত্রে পরিণামে প্রকৃতিনির্ভর। বিচিত্র স্থানের উল্লেখ আছে—'সিংহল সমুদ্র', 'মালয় সাগর' 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ', 'বিদর্ভ-নগর'; লক্ষণীয় প্রথম দুটি সমুদ্রপথযাত্রা—কালহীন, দ্বিতীয় দুটি স্থান লুপ্ত সভ্যতার এবং চারটি প্রসঙ্গই এশিয়ার। আন্তর্জাতিক দৃশ্য—বহু ইতিহাসের বহু কালের পরিবেশ কবিকে টানছে। কবিতাটির সাংগঠনিক সতর্কতাও লক্ষণীয়। প্রথম-তৃতীয়, দ্বিতীয়-চতুর্থ ও পঞ্চম-ষষ্ঠ মিলের ছয় চরণের তিনটি স্তবকে কবিতাটি সাজানো।

প্রথম স্তবকে :

হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

দু'টি প্রসঙ্গ লক্ষণীয় :

১. 'হাজার বছর' পথ-পরিক্রমায় এই 'ক্লান্ত প্রাণ' দেখছে 'চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন';—এই 'জীবন' প্রকৃতিসংলগ্ন জীবন।

২. 'আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো'—অতীতকালের ক্রিয়াপদে 'নাটোরের বনলতা সেনে'র উপস্থিতি।

নাটোর ও বনলতা সেন উল্লেখে স্থান ও ব্যক্তিনাম সুনির্দেশিত হয় বটে কিন্তু সেটুকুই মুখ্য নয়।

দ্বিতীয় স্তবকে বনলতা সেনের রূপের বর্ণনা : মাত্র দেড়টি চরণে—বর্তমানের কোনো দীপ্ত জীবন্ত তুলনায় নয়, দু'টি লুপ্ত সভ্যতার দূর অতীতের রূপকে :

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; ...

এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পর কিভাবে কোন চোখে প্রথম বনলতা সেনকে দেখেছিলেন অতীতের বর্তমানে যেয়ে সেই প্রসঙ্গ :

অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

'যে-নাবিক' 'অতিদূর সমুদ্রে' 'হাল ভেঙে' দিশাহারা সে 'দারুচিনি দ্বীপের[৮] ভিতর' সবুজ ঘাসের দেশ দেখলে অকস্মাৎ যেমন জীবন-সম্ভাবনায় জেগে ওঠে ; তেমনিভাবে, সেই চোখে বনলতা সেনকে দেখছেন প্রকৃতির জীবনের সফেন সমুদ্রে ভাসমান 'ক্লান্ত প্রাণ' কবি। বনলতা সেন তাকিয়েছে 'পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে' ; বলাবাহুল্য, হাল ভাঙা নাবিকের চিত্রকল্পের পাশে প্রকৃতির উপাদান 'পাখির নীড়' এখানে আশ্রয়েরই উপমা।[৯]

তৃতীয় ও শেষ স্তবকে 'সমস্ত দিনের শেষে', অর্থাৎ জীবনের শেষে, 'শিশিরের শব্দের মতন' সন্ধ্যা আসছে। শিশিরের শব্দ＝শিশির পতনের শব্দ＝নিস্তব্ধতা—এ নিস্তব্ধতা মৃত্যুর। জীবনের শেষে মৃত্যুর নিস্তব্ধতার সন্ধ্যা আসছে। তখন 'ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল' এবং—

পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;

জীবনের সমাপ্তিতে, মৃত্যুর নিস্তব্ধতার মধ্যে, পৃথিবীর সব রঙ নিভে, জোনাকির আলোতে প্রকৃতির গল্পের আয়োজন।

সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন ;

সব পাখী সব নদী যেমন ঘরে ফিরেছে, তেমনি জীবনের সব লেনদেনও সমাপ্ত হয়েছে এবং তখন :

থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।
(কাব্য সম্ভার, পৃ. ১৪৭)

রূপসী বাংলার 'ঘাসে অন্ধকারে' মৃত্যুপর 'শালিখ'কে যেমন 'হঠাৎ' 'বনের হিজল গাছ' 'ডাক দিয়ে নিয়ে যায় হৃদয়ের পাশে', তেমনি এখানে অন্ধকারে বনলতা সেনের মুখোমুখি কবি তাঁর সমস্ত পরিভ্রমণের, চিন্তার, চেতনার পরিণতিতে বিলীন হয়ে যাচ্ছেন। লক্ষণীয় বনলতা নামটিও প্রকৃতির উপাদানে (বনের লতা) কল্পিত।

'বনলতা সেন'-এর উপসংহার ''হাজার বছর শুধু খেলা করে'' শীর্ষক কবিতা। এখানে মৃত্যু-পরবর্তী চেতনার বর্ণনা :

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো :
চারিদিকে পিরামিড—কফিনের ঘ্রাণ ;
বালির উপরে জ্যোৎস্না—খেজুর-ছায়ারা ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো : এশিরিয়—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।[১০]

প্রতি চিত্রকল্পে মৃত্যুর নানা অনুষঙ্গ। এখানে 'অন্ধকারে' 'জোনাকির মতো' মহাকাল-স্রোত 'হাজার বছর শুধু খেলা করে'। পরিবেশে 'পিরামিড, কফিনের ঘ্রাণ' 'বালির উপরে জ্যোৎস্না' এবং 'বিচূর্ণ থামের মতো' 'ইতস্তত' খেজুর গাছের নানা ছায়া। সেই সঙ্গে রূপসী বাংলার সূচনায় উল্লেখিত লুপ্ত সভ্যতার ইঙ্গিতবহ 'এশিরিয়' এখানে পুনরুচ্চারিত—'এশিরিয়—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান'। শেষ দুটি চরণে জীবনের সব লেনদেন বিমুক্ত কবি ও বনলতার 'শরীরে মমির ঘ্রাণ' :

শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন
'মনে আছে ?' শুধালো সে—শুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন ?'
(কাব্য সম্ভার, পৃ. ১৬৬)

দুই

প্রধানতঃ তাঁর চিত্রকল্পের ব্যাখ্যা-সূত্রে জীবনানন্দ দাশকে বাংলা কবিতায় পরাবাস্তব বা সুরিয়ালিজমের 'প্রবর্তক' বলে বারংবার উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বিষয়টির পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন।

আন্দ্রে ব্রেতঁর নেতৃত্বে কয়েকজন ফরাসী লেখক দাদাবাদ থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেন সুরিয়ালিজম। দাদা আন্দোলনের উৎসভূমি ছিল জুরিখ। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিভিন্ন জাতির দেশান্তরী একদল তরুণ জুরিখে দাদা আন্দোলন শুরু করেন।—

> Dada was 'against everything' (including Dada) and had been composed in unequal proportions of an understandable disgust with world conditions, boredom and the desire of individuals for self-advertisement.[১১]

দাদাবাদ প্যারীসে আনেন ত্রিস্তান জারা। জারাকে বাদ দেবার পর বিশের দশকে ফরাসী স্যুরিয়ালিজমের সুনির্দিষ্ট রূপ দাঁড়ায় এরকম :

> Pure Psychic automatism by means of which it is proposed to express, either verbally, in writing, or in any other way, the real process of thought--in the absense of all control exercised by reason and outside all aesthetic or moral considerations.[১২]

স্যুরিয়ালিজমের এই তত্ত্ব অবচেতনের ওপরে গুরুত্বারোপ এসেছে ফ্রয়েডের তত্ত্বের ভিন্নার্থক প্রয়োগ-প্রয়াস থেকে : 'স্বপ্নের গুরুত্ব' ও 'স্বয়ংক্রিয় লেখা' স্যুরিয়েলিস্টদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে সুচিহ্নিত হল। অচিন্ত্যপূর্বের উপরিস্থাপনে বিশ্বাসী ফরাসী স্যুরিয়েলিস্টদের ডিলান টমাস অভিহিত করেছেন 'সুপাররিয়ালিস্ট' অর্থাৎ "those who work above realism"[১৩] বলে। ফরাসী স্যুরিয়েলিস্টরা রিয়েলিস্ট অর্থাৎ যাঁরা "Tried to put down in paint or words an actual representation of what they imagined to be the real world in which they tried"[১৪] এবং ইম্প্রেশনিস্ট অর্থাৎ যাঁরা "Tried to give impression of what they imagined to be the real world"[১৫]—এই উভয়েরই বিরুদ্ধে। স্যুরিয়েলিস্টরা ডুব দিতে চাইলেন সচেতন মনের উপরিস্তরের নীচের অবচেতন মনে, সেখান থেকে তুলে আনতে চাইলেন ইমেজ : "without the aid of logic or reason, and put them down, illogically and unreasonably in paint and words."[১৬]

দাদাবাদ ছিল ধ্বংসাত্মক, সব কিছুর 'এন্টি'; স্যুরিয়ালিজম রিয়ালিজম ও ইমপ্রেশনিজমের 'এন্টি', তবে দাঁড়াতে চেয়েছে ফ্রয়েডের অবচেতন মনের তত্ত্বের ভিত্তিতে। ফ্রয়েডের তত্ত্বানুযায়ী যেহেতু মনের তিন-চতুর্থাংশই অবচেতন, সুতরাং স্যুরিয়েলিস্টরা চেতন এক-চতুর্থাংশের বদলে অবচেতন তিন-চতুর্থাংশ থেকে কবিতার উপাদান সন্ধানী হলেন। তাঁদের প্রক্রিয়া, ডিলান টমাসের ভাষায় :

> One method the surrealists used in their poetry was to juxtapose words and images that had no rational relationship ; and out of this they hoped to achieve a kind of subconscious, or dream, poetry that would be truer to the real imaginative world of the mind, mostly submerged, than is the poetry of the conscious mind, which

relies upon the rational and logical relationship of ideas, objects and images.[১৭]

ফরাসী সুরিয়েলিস্টরা মানব-প্রকৃতিকে 'অধিকতর সত্য'স্বরূপে উপস্থাপনের প্রয়াসী হয়েছেন। ব্রেরেটনের মতে, তাঁদের অবচেতনের স্বীকৃতি, সাহিত্যক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান এবং প্রতীকীদের আবিষ্কার-অতিক্রমী। তাঁদের সীমাবদ্ধতা এই যে তাঁরা ফর্মের সমস্যার কোন সমাধান খুঁজে পাননি। ব্রেরেটনের ভাষায় :

The problem it has never solved is the problem of form. Here it could not innovate since it expressly disclaimed 'aesthetic considerations'. Neither could it reject entirely, since to write at all is to use a form, however unplanned it may appear. So it has simply taken over existing forms and has used them very loosely, free verse drifting into the prose poem and tne prose poem sometimes expanding into the long personal symbolic or doctrinaine work which may look like a novel but for which no satisfactory name has been found. The distinction between poetry and prose is largely abolished as being of small importance, but because of the stress laid on symbols and images most surrealist writing appears 'poetic' to readers accustomed to associate prose with the realistic and the rational.[১৮]

সুরিয়েলিস্টদের এই প্রকৃত পরিচয়সূত্র স্মরণ রাখলে জীবনানন্দ দাশের কোন কবিতাকেই আদ্যন্ত সুরিয়েলিস্ট বলা যায় না। সন্দেহ নেই, জীবনানন্দের বহু চিত্রকল্পে পরাবাস্তব চেতনা লক্ষণীয়। ডক্টর দীপ্তি ত্রিপাঠী (১৯৫৬)[১৯] ও ডক্টর অশ্রুকুমার শিকদার (১৩৮২)[২০] কর্তৃক উদ্ধৃত কিছু কাব্যাংশ নিম্নরূপ :

১. কারা এসে ব'লে গেল : 'নেই
গাছ নেই—রোদ নেই—মেঘ নেই—তারা নেই—আকাশ তোমার
তরে নয়।'
("নদীরা", কাব্য সম্ভার, পৃ. ৯৯)

২. স্বপ্নের ভিতরে বুঝি—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
দেখিলাম পলাশের বনে খেলা করে

হরিণেরা, রূপালি চাঁদের হাত শিশিরে পাতায় ;
বাতাস ঝাড়িছে ডানা—মুক্তা ঝ'রে যায়

পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে—বনে বনে—হরিণের চোখে ;
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর মুক্তার আলোকে।
("হরিণেরা", কাব্য সম্ভার, পৃ. ১৫৬)

৩. মনে হয়
কারা যেন বড়ো-বড়ো কপাট খুলেছে,
বন্ধ ক'রে ফেলেছে আবার ;
কোন দূর—নীরব—আকাশরেখার সীমানায়।

... ...

চোখ তুলে আমি
দুই স্তর অন্ধকারের ভিতর ধূসর মেঘের মতো প্রবেশ করলাম ;
সেই মুখের ভিতর প্রবেশ করলাম।
("শ্রাবণরাত", কাব্য সম্ভার, পৃ. ১৮০-৮১)

৪. কিন্তু এই নদী
রাঙা মেঘ—হলুদ-হলুদ জ্যোৎস্না ; চেয়ে দ্যাখো যদি ;
অন্য সব আলো আর অন্ধকার এখানে ফুরালো ;
লাল নীল মাছ মেঘ—ম্লান নীল জ্যোৎস্নার আলো
এইখানে ; এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব
ভাসিতেছে চিরদিন : নীল লাল রূপালি নীরব।
("শব", কাব্য সম্ভার, পৃ. ১৮৩)

৫. তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে,
পৃথিবীর সব গল্প একদিন ফুরাবে যখন
মানুষ রবেনা আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন :
সেই মুখ আর আমি রবো সেই স্বপ্নের ভিতরে।
("স্বপ্ন", কাব্য সম্ভার, পৃ. ১৮৪)

কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ[২১] উল্লেখ করেছেন "বিভিন্ন কোরাসের" একটি চরণ :

ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস

ডক্টর দীপ্তি ত্রিপাঠী 'ঘোড়া' ("নিরালোক", মহাপৃথিবী), 'শেয়ালেরা' ("যেই সব শেয়ালেরা", সা.তা.তি.) 'হাঁস' ("হাঁস", সা.তা.তি.) প্রভৃতি প্রতীক ব্যবহারের কথাও পরাবাস্তব প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন ; অবশ্য নিজেই নির্দেশ করেছেন প্রতীক বলে।[২২]

কবিতার অনুষঙ্গ থেকে আলাদা করে ঐ-ভাবে তুলে ধরলে ঐ-সব চরণ বা কবিতাংশ সুরিয়েলিস্ট মনে হতে পারে ; যদিও লক্ষণীয় উদ্ধৃতাংশে অন্বয়ের অভাব নেই।

"স্বপ্ন" কবিতাটিতে সুরিয়েলিস্টের মত স্বপ্ন-ধ্যান আছে। কিন্তু সমগ্র কবিতায় সুরিয়েলিস্ট 'ক্যাওসের' (chaos) কোন পরিচয় নেই। বরং সব সময়ই আছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যৌক্তিক পারম্পর্য এবং অবশেষে অর্থময় ভাষা। অর্থাৎ পরাবাস্তব জীবনানন্দকে আমুণ্ড গ্রাস করেনি। তিনি বাংলা কবিতায় পরাবাস্তবের উপমা-রূপক-চিত্রকল্প প্রথম ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ঐ-সব প্রয়োগ ছিন্নভিন্ন অবিন্যস্ত অশোধিত নয় এবং তাঁর কবিতা অবশেষে সুনির্দিষ্ট বক্তব্যের মোকামে পৌঁছে দাঁড়িয়েছে। খুবই ন্যায়সঙ্গত যে জীবনানন্দ তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকায় সমালোচক-উক্ত কোন এক বা একাধিক বিশেষণে ধরা দিতে অসম্মতি জানিয়েছেন।

তাঁর কবিতা সুরিয়েলিজম-জাত এই অভিমত খণ্ডন করতে ডিলান টমাস যা বলেছিলেন তা জীবনানন্দ সম্পর্কেও প্রয়োগযোগ্য বলে আমার মনে হয়। ডিলান টমাস বলেছেন :

> I do not mind from where the images of a poem are dragged up : drag them up, if you like, from the nethermost sea of the hidden self; but before they reach paper, they must go through all the rational process of intellect. The surrealist on the other hand, put their words down togather on paper exactly as they emerge from chaos : they do not shar.e these words or put them in order ; to them, chaos is the shape and order. This seems to me to be exceedingly presumptious, the Surrealist imagine that whatever they dredge from their subconscious selves and put down in paint or in words must, essentially, be of some interest or value. I deny this. One of the arts of the poet is to make comprehensible and articulate what might emerge from Subconscious sources; one of the great main uses of the intellect is to select, from the amorphous mass of subconsoious images, those that will best further his imaginative purpose, which is to write the best poem he can.[২৩]

জীবনানন্দ দাশের উপমা-রূপক-চিত্রকল্প এই অর্থেই সুরিয়েলিজম-আক্রান্ত কিন্তু তাঁর কবিতা সুরিয়েলিজম-অতিক্রান্ত।

তিন

জীবনানন্দ দাশের বিভিন্ন কবিতায় কয়েকজন ইংরেজ কবির প্রভাবের প্রসঙ্গ কোন কোন সমালোচক উপস্থাপন করেছেন। এই প্রসঙ্গটিও পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন বলে মনে করি।

"মাঠের গল্পের" অন্তর্গত "মেঠো চাঁদ" কবিতায় এলিয়টের অনুপ্রেরণা প্রত্যক্ষ। এই অনুপ্রেরণা কেন্দ্রীয় বক্তব্যগত। প্রকৃতিতে মানুষের প্রত্যাশার আর কিছু নেই। 'ডাইনে আর বাঁয়ে / পোড়ো জমি-খড়-নাড়া-মাঠের ফাটল / শিশিরের জল'; ঐ মাঠে 'ফসল গিয়েছে ঢের ফলি / শস্য গিয়েছে ঝরে কত'। শুধু তাই নয়, মানুষের 'লাঙ্গলের ধার'ও 'মুছে গেছে'। চাঁদের কাছেও কোন প্রেরণা নেই, ঐ চাঁদও 'বুড়ো হয়ে গেছে 'এই বুড়ী পৃথিবীর মতো'। সুতরাং এখন কেবল 'পোড়ো জমি'ই সত্য। স্পষ্টতঃই পোড়ো জমি *The Waste Land* ছাড়া আর কিছু নয়। নামের প্রতিধ্বনিতে এবং বক্তব্যের উপসংহারে এলিয়টের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ। কিন্তু আমার মনে হয়, জীবনানন্দের কবিতা ঐ অনুপ্রেরণার কাঠামো ছাড়িয়ে স্বভূমি পেয়েছে। প্রথমেই লক্ষণীয়: তিন অংশে বিভক্ত কবিতাটির গঠনে নাটকীয় কৌশল। প্রথমাংশে শুধুই বর্ণনা :

মেঠো চাঁদ রয়েছে তাকায়ে
আমার মুখের দিকে, ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়ো জমি—খড়—নাড়া—মাঠের ফাটল,
শিশিরের জল।
মেঠো চাঁদ—কাস্তের মত বাঁকা, চোখা—
চেয়ে আছে; এমনি সে তাকায়েছে কতোরাত—নাই লেখা-জোখা।

এর দ্বিতীয়াংশে মেঠো চাঁদের সংলাপ, কবিকে সে বলছে:

মেঠো চাঁদ বলে:
'আকাশের তলে
খেতে-খেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে—ফসল-কাটার
সময় আসিয়া গেছে, চ'লে গেছে কবে!
শস্য ফলিয়া গেছে—তুমি কেন তবে
রয়েছ দাঁড়ায়ে
একা-একা! ডাইনে আর বাঁয়ে
খড়-নাড়া—পোড়ো জমি—মাঠের ফাটল,
শিশিরের জল।'

পৃথিবীর প্রকৃতিতে কবির কোন ফসল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই, তবে কেন কবি একা একা পোড়ো জমিতে দাঁড়িয়ে? তৃতীয়াংশে, কবির উত্তর: মেঠো চাঁদকে দেখে প্রথম স্তবকে কবির মনে পড়েছিল ফসল কাটায় যে-কাস্তের প্রয়োজন পড়ে সেই কাস্তের উপমা। সেই চাঁদ যখন কবিকে পৃথিবীর প্রকৃতির সম্ভাবনাহীনতার কথা শোনালো তখন

কবি বিস্মৃত হচ্ছেন কাস্তে-প্রসঙ্গ —ফসল নেই, কাস্তেরও প্রয়োজন নেই। কবি মেঠো চাঁদকে বলছেন :

> আমি তারে বলি :
> ফসল গিয়েছে ঢের ফলি,
> শস্য গিয়েছে ঝ'রে কতো——
> বুড়ো হ'য়ে গেছো তুমি এই বুড়ী পৃথিবীর মতো!
> খেতে-খেতে লাঙলের ধার
> মুছে গেছে কতোবার——কতোবার ফসল-কাটার
> সময় আসিয়া গেছে চ'লে গেছে কবে।
> শস্য ফলিয়া গেছে——তুমি কেন তবে
> রয়েছ দাঁড়ায়ে
> একা একা! ডাইনে আর বাঁয়ে
> পোড়ো জমি——খড়——নাড়া——মাঠের ফাটল,
> শিশিরের জল!
>
> (কাব্য সম্ভার, পৃ. ৮)

কবিতার মধ্যে ফসলহীনতার বেদনাকে ছাড়িয়ে গেছে নাট্যিক সূক্ষ্ম কৌতুক ; সামান্য অদলবদল ক'রে তিন অংশে একই চরণগুচ্ছের তিনবার ব্যবহারে অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যেমন দেখি মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র "দশরথের প্রতি কেকয়ী" পত্রে 'পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি'[২৪] এই চরণের নাট্যিক পৌনঃপুনিক ব্যবহারে সৃষ্ট অসামান্য ধ্বনিদ্যোতনায়। সুতরাং এই কবিতায় এলিয়টের অনুপ্রেরণা আছে কিন্তু সমগ্র কবিতায় এলিয়ট নেই।

'বনলতা সেন' কাব্যের "হায় চিল" কবিতা পড়ে স্বাভাবিক ভাবেই ডক্টর দীপ্তি ত্রিপাঠীর মনে পড়েছে[২৫] ইয়েটসের *He Reproves The Curlew* কবিতার সঙ্গে 'সাদৃশ্য'। বিশেষতঃ ইয়েটসের কবিতার এইসব চরণ :

> O Curlew, cry no more in the air,
> Or only to the water in the West;
> Because your crying brings to my mind
> Passion-dimmed eyes and long heavy hair
> That was Shaken out over my breast;
> There is enough evil in the crying of wind.[২৬]

তবু মিলিয়ে দেখা যাক 'সাদৃশ্যের' স্বরূপ কি ? 'হায় চিল' কবিতায় আছে :

> হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
> তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে!

তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে ;
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে ;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো ? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে !
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে।
(কাব্য সম্ভার, পৃ. ১৫১-৫২)

উদ্ধৃত ইয়েটসের কবিতার মিল কখগ কখগ। জীবনানন্দের কবিতার মিল কখ খক কখ কখ—এর মধ্যে শেষ দু'চরণ প্রথম দু'চরণেরই সামান্য পরিবর্তিত পুনরাবৃত্তি এবং ভগ্ন ষষ্ঠ চরণ প্রকৃতপক্ষে পঞ্চম চরণেরই প্রলম্বন।

ইয়েটস Curlew-কে বাতাসে বা পশ্চিমের জলে কাঁদতে নিষেধ করছেন ; O Curlew এর বেশি তিনি সম্বোধন করেন না। অন্যদিকে জীবনানন্দ O Curlew-এর প্রতিধ্বনি তুলছেন 'হায় চিল' সম্বোধনে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যোগ করছেন আরো একটি অতিরিক্ত ছবি—চিলের অতিরিক্ত পরিচয় 'সোনালি ডানার চিল'। পরিবেশে জীবনানন্দ যোগ করছেন আরো দুটো ছবি : 'ভিজে মেঘের দুপুর', 'ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে'। Curlew-র কান্নায় ইয়েটসের মনে পড়ছে একদা তাঁর বুকে লুটানো লম্বা ঘন চুল এবং সেই নারীর আসক্তি-নমিত চোখ। জীবনানন্দের মনে পড়ছে 'বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ', 'পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে'। ইয়েটসের স্মৃতিবাসিনীর উল্লেখে কাম মুখ্য, জীবনানন্দের প্রেম মুখ্য। শেষ চরণে ইয়েটস যখন বলছেন, 'বাতাসের কান্নায় যথেষ্ট অশুভ আছে' ; তখন জীবনানন্দ বলছেন : 'আবার তাহারে কেন ডেকে আনো ? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে / বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।' প্রথমাংশে প্রশ্ন, দ্বিতীয়াংশের বিষয়চিহ্নিত নিরুপায় নিষেধ।

সন্দেহ নেই, 'হায় চিল'-এ ইয়েটসের উপস্থিতি সুপ্রত্যক্ষ। কিন্তু এখানেও শেষ পর্যন্ত ইয়েটস অনুপ্রেরণা। জীবনানন্দ একটি অসামান্য উপমায় (বেতের ফলের মতো ম্লান চোখ), দু'টি সচল ছবিতে (ভিজে মেঘের দুপুর ও ধানসিঁড়ি নদী) এবং প্রেমানুভবের ঋজুতায় ও সামগ্রিক ব্যঞ্জনায় ইয়েটসকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছেন।

জীবনানন্দের 'সমারূঢ়'র (সাতটি তারার তিমির, কা. স., পৃ. ২৫০) সঙ্গে ইয়েটসের The Scholar[২৭]-এর সাদৃশ্যও বহুল আলোচিত প্রসঙ্গ। এখানেও সাদৃশ্যের সীমা পরীক্ষাযোগ্য।

The Scholar

Bald heads forgetful of their sins,
Old, learned, respectable bald heads

Edit and annotate the lines
That young men, tossing on their beds,
Rhymed out in loves despair
To flatter beauty's ignorant ear
All shuffle there ; all cough in ink
All wear the carpet with their shoes ;
All think what other people think :
All know the man their neighbour knows.
Lord, what would they say
Did their catallus walk that way ?

সমারূঢ়

"বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা—"
বলিলাম ম্লান হেসে ; ছায়াপিণ্ড দিলো না উত্তর ;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়—সে যে আরূঢ় ভণিতা
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের 'পর
বসে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর অক্ষর
অধ্যাপক, দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি ;
বেতন হাজার টাকা মাসে—আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি ;
যদিও সে-সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিলো—হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি ।
(কাব্য সম্ভার. পৃ. ২৫০)

ডক্টর অশ্রুকুমার শিকদার লিখেছেন : "এই মুহূর্তে সম্ভবতঃ, অনুকরণ ছাড়া এই সাদৃশ্যের অন্য কোনো ব্যাখ্যাই আমরা খুঁজে পাবো না।"[২৮] আমি ডক্টর শিকদারের সঙ্গে একমত নই। ধরে নেয়া যাক ইয়েটসের 'দি স্কলার' পড়েই জীবনানন্দ দাশ 'সমারূঢ়' লিখেছেন। উভয় কবিতার আক্রমণের লক্ষ্য সৃষ্টিক্ষমতাহীন পণ্ডিত। সাদৃশ্য ঐ-টুকুই। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ইয়েটসের কবিতা বর্ণনাত্মক এবং তার স্কলারের যে পরিচয় : "টেকো মাথা স্বপাপ-বিস্মৃত / বৃদ্ধ, জ্ঞানী, সম্মানিত টেকো মাথা"—সন্দেহ নেই প্রবল বিদ্বেষ-প্রসূত উচ্চারণ।

'সৌন্দর্যের মূর্খ-শ্রবণ বিমোহনে'র জন্যে তরুণেরা বিছানায় ছটফট করে যে পংক্তি-মালা লিখেছিল', স্কলার এখন তা 'সম্পাদনা করছে, টীকা লিখছে'—বোঝা যাচ্ছে অনভিপ্রেত গন্তব্যে গেছে কবিতা। এর পাশে সমারূঢ় কোন সরল বর্ণনা নয়, কবিতাটিতে সৃষ্ট হয়েছে একটা নাট্যমুহূর্ত। উপদেশপ্রবণ সমালোচক শেখা বুলির ফর্মুলায়

ফেলে কবির ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখাচ্ছেন; 'এ রকম লেখো, ও রকম লেখো'—বলে কবিকে দিচ্ছেন নানারকম প্রেসক্রিপশন। সাধারণতঃ কবি কোন জবাব দেন না। কিন্তু এবার প্রবল আক্রমণের মুখে মরিয়া হয়ে কবি ম্লান হেসে সমালোচককে বিনীতভাবে বললেন, এতই যখন বোঝো, তখন আমাকে বলো কেন? তোমার নিজের কবিতা তুমি নিজে লিখে নিলেই পার : 'বরং নিজেই তুমি লেখনাকো একটি কবিতা'। তৎক্ষণাৎ প্রগলভতা শেষ, ''ছায়াপিণ্ড দিল না উত্তর। বুঝিলাম সে তো কবি নয়''। সৃষ্টি-ক্ষমতাহীন উপদেশ-সর্বস্ব সমালোচকের উদ্দেশ্যে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন চপেটাঘাত-কাবতা লেখা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এখানে সমালোচককে কবি 'অধ্যাপক' বলেছেন—নিজে অধ্যাপক ছিলেন সে-কারণেও হতে পারে; যদি অন্য পেশা গ্রহণ করতেন, যেমন সাংবাদিকতা—হয়ত বলতেন সেই পেশার কথা।

শেষ দুটি চরণ, সন্দেহ নেই, ইয়েটসের তুলনীয় পংক্তির চেয়ে উৎকৃষ্টতর। যে-সব মৃত কবির পাণ্ডুলিপির টীকা-ভাষ্য রচনায় অধ্যাপক রত জীবদ্দশায় সে-সব কবির ক্ষুধা ছিল, প্রেমের ও আগুনের সেঁকের প্রত্যাশা ছিল; কিন্তু তখন সমালোচক ও সমকাল নামক হাঙরের ঢেউ তাদের ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়েছে, আর এখন দন্তহীন, দৃষ্টিহীন খুঁটছে তার মাংস-কৃমি। কবিতাটিতে ব্যঙ্গ আছে, বিদ্বেষ নেই। আমার মতে 'সমারূঢ়' যতটা না ইয়েটস-প্রভাবিত তার চেয়ে বেশী ইয়েটস-অনুপ্রাণিত; একে কোন ক্রমেই অনুকরণ বলা যায় না। সামগ্রিকভাবে দেখলে বরং 'সমারূঢ়'কে শ্রেষ্ঠতর কবিতা বলতে হয়।

''অদ্ভুত আঁধার এক'' (কাব্য সম্ভার, পৃ. ৪৬৯) কবিতায়ও ইয়েটসের *The Second coming*[২৯]-এর অনুপ্রেরণা আছে, যেমন আছে ঐ কবিতার 'যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশী আজ চোখে দ্যাখে তারা' চরণে ডিলান টমাসের So the blind man sees best চরণের প্রত্যক্ষ প্রতিধ্বনি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য জীবনানন্দ দাশের বিভিন্ন কবিতার চরণাংশে কীটস, ইয়েটস, ডি. এইচ. লরেন্স, টি. এস. এলিয়ট, ডিলান টমাস ও আরো দু' একজন ইংরেজী ভাষার কবির চরণের ও চিন্তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে। যেমন 'ঝরা পালকে' ছিল সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুলের প্রতিধ্বনি। 'ঝরা পালকে'র কাল ছিল আত্মানুসন্ধানের জন্যে পূর্বসূরি কাব্যধারায় অবগাহন আর পরবর্তী কাব্যসমূহের কাল হচ্ছে ইওরোপ-মনস্কতার, সংশ্লেষ চেতনার, বিশ্ব প্রেক্ষাপটে প্রসৃত আত্ম-আবিষ্কারের। অনুপ্রেরণার সন্ধানে জীবনানন্দের এই আহরণের সঙ্গে তুলনীয় মধুসূদন, এজরা পাউণ্ড, টি. এস. এলিয়েটের আহরণ। মৌলিকত্বের প্রশ্নে এলিয়টের মন্তব্যও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য :

> The poem which is absolutely original is absolutely bad; it is in the bad sense "subjective", with no relation to the world to which it appeals.

...True originality is merely development and if it is the right development it may appear in the end so inevitable that we almost come to the point of view of denying all "original" virtue to the poet. He simply did the next thing.

এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয় গোয়েটের সেই সুবিখ্যাত কবিতা 'মৌলিকতার প্রশ্নে' : ৩০

১

কেউ কেউ বলে, "আমি নেই কোন দলে,
বিকাইনি হৃদয় কোন জীবিত প্রভুর পদতলে,
পারি না বলতে এমনও
মৃত কারো কাছ থেকে কোনো কিছু শিখেছি কখনো।"
সংশোধন সাপেক্ষে এ-কথার সরলার্থ, সাদা :
"আমি এক স্বরচিত স্বয়ম্ভূ-প্রবর, হারামজাদা।"

২

আমার শরীর আমি পেয়েছি পিতার থেকে উত্তরাধিকারে,
তাঁর পরিচ্ছন্ন ঋজু ভঙ্গিমারে,
আর সেই সাথে যুক্ত মায়ের সানন্দ সত্তা, আশা,
তাঁর গল্প বলতে ভালবাসা ;
ভাল যে বেসেছিলেন আমার প্রপিতামহ সুন্দরী-শ্রেষ্ঠাকে
তাঁর প্রেত ছাড়ে না আমাকে ;
একথাও জানি আমি, রত্নরাজি, উজ্জ্বল চুণীর,
বড়ই পছন্দ ছিল প্রমাতামহীর।

সমগ্রতা থেকে তার উপাদানসমূহ সঠিক
বিচ্ছিন্ন করতে যদি ব্যর্থ হন রসায়নবিদ বৈজ্ঞানিক,
মৌলিকতা বলা যায় যাকে
মানুষের কোন অংশে, কোথায় সে থাকে ?

চার

মানব ইতিহাসের বহমানতার ধারণা থেকেই জীবনানন্দ দাশ বিশ্বমানবিক ঐতিহ্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার উত্তরাধিকার দাবী করেছেন। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, পাউন্ড ও এলিয়টের

মতোই পূর্বসূরি কবিবৃন্দের ঐতিহ্যের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে তিনিও সন্ধান করেছেন নিজস্ব প্রাসঙ্গিকতা।

কবি-জীবনের সূচনায় ছিল আত্ম-আবিষ্কারের মুগ্ধতা :

কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—
আমি বহে আনি ;
একদিন শুনেছ যে-সুর—
ফুরায়েছে,—পুরানো তা—কোনো এক নতুন-কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন
আর নাই কেহ !
সৃষ্টির সিন্ধুর বুকে আমি এক ঢেউ
আজিকার ;—শেষ মুহূর্তের
আমি এক ;—সকলের পায়ের শব্দের
সুর গেছে অন্ধকারে থেমে ;
তারপর আসিয়াছি নেমে
আমি ;
আমার পায়ের শব্দ শোনো—
নতুন এ—আর সব হারানো—পুরোনো।
("কয়েকটি লাইন" ; কাব্য সম্ভার, পৃ. ১৫)

সমগ্র কবি-জীবনে এই 'নতুন'-নির্মাণে তিনি অভিনিবিষ্ট হয়েছেন, অধীত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নানা বর্ণালোকে। গ্রাম-জীবনে যেমন তিনি বিনষ্টিকে দেখেছেন তেমনি দেখেছেন নগর-জীবনের "নীলিমা" ঢেকে যাচ্ছে কালো ধোঁয়ায়। সভ্যতার সম্ভাবনাহীনতার উপলব্ধি নিয়ে মনে হয়েছে : সহজ নয় সাধারণ কৃষকের মত 'উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে থাকা ("বোধ", কাব্য সম্ভার, পৃ. ৩৪) ; এমনকি কৃষকের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেয়েও নয় :

হাতে তুলে দেখিনি কি চাষার লাঙল ?
বাল্‌টিতে টানিনি কি জল ?
কাস্তে হাতে কতোবার যাইনি কি মাঠে ?
মেছোদের মতো আমি কতো নদী ঘাটে
ঘুরিয়াছি ;
পুকুরের পানা শ্যাওলা—আঁশটে গায়ের ঘ্রাণ গায়ে
গিয়েছে জড়ায়ে ;

কিন্তু এ-জীবন 'অবাধ' থাকেনি; 'চলে গেছি ইহাদের ছেড়ে'। ভালবাসাও পরিণামে 'ধুলো আর কাদা'। বোধ, উপলব্ধিই কবিকে স্বতন্ত্র করেছে;

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
আমার পথেই শুধু বাধা?

কেননা—

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে।

আত্মোপলব্ধিও শান্তিপ্রদ নয়, কেননা আস্থা নেই সমকালে, প্রেমে, কি ভবিষ্যতে:

আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চ'লে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে:
সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয়!
অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?
কোনোদিন ঘুমাবেনা? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবেনা কি? পাবেনা আহ্লাদ
মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন!
মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন!
শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন!

মানুষ অর্থাৎ সমকাল, মানুষী অর্থাৎ প্রেম, শিশু অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কোন কিছুতেই সম্ভাবনা নেই, আস্থা নেই—'এই বোধ—শুধু এই স্বাদ'। পরিণামে তাই সমকালীন বাস্তবতার তীব্র চিত্রাবলী;

চোখে কালো শিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজ—গলাগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
সে-সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেই সব।
("বোধ", কাব্য সম্ভার, পৃ. ৩৫-৩৭)

"ক্যাম্পে" কবিতার অসামান্য নাট্যিক দ্যোতনায় 'বসন্তের রাতে' যখন 'লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন স্ফুট হয়ে উঠিতেছে সব দিকে' তখনই 'হিংসা' প্রবল হয়ে ওঠে, শোনা যায় 'বন্দুকের শব্দ' :

প্রেমের সাহস সাধ স্বপ্ন ল'য়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই ;
পাই না কি ?

তাই অনিবার্য উপসংহার :

এই ব্যথা—এই প্রেম সব দিকে র'য়ে গেছে—
কোথাও ফড়িঙে-কীটে—মানুষের বুকের ভিতরে
আমাদের সবের জীবনে।
বসন্তের জ্যোৎস্নায় ওই মৃত মৃগদের মতো
আমরা সবাই।
(কাব্য সম্ভার, পৃ. ৪৫-৪৬)

"১৩৩৩" শীর্ষক কবিতায় কবির প্রেমোপলব্ধির উচ্চারণ : 'দেহ ঝরে, তার আগে আমাদের ঝরে যায় মন'। এই কবিতায় 'শরীর' শব্দের ব্যবহার বুদ্ধদেব বসুকে মুগ্ধ করেছিল।[৩১] প্রেমিকা একদা তার 'শরীর নিয়ে' এসেছিল, আজ সে নেই, কবি পৃথিবীর পথে ছিন্ন-ভিন্ন, বহুলাংশে সুধীন্দ্রনাথের মত[৩২] স্মৃতিদীর্ণ :

তোমার শরীর,—
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার ;—তারপর মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্ দিকে জানিনি তা, —হয়েছে মলিন
চক্ষু এই!—ছিঁড়ে গেছি,—ফেঁড়ে গেছি, —পৃথিবীর পথে হেঁটে-হেঁটে
কতো দিন-রাত্রি গেছে কেটে!
কতো দেহ এলো,—গেলো,—হাত ছুঁয়ে-ছুঁয়ে
দিয়াছি ফিরায়ে সব ;—সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে
নক্ষত্রের তলে
বসে আছি,—সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া!
(কাব্য সম্ভার, পৃ. ৬৩)

প্রেম এবং আশার পূর্ণতাও মানুষকে একাকিত্বের বিপন্নতায় টানে। প্রেমের পূর্ণতার বা মিলনের মুহূর্তেই সুধীন্দ্রনাথ মৃত্যু কামনা করেছিলেন গভীর রোমান্টিকতায়।[৩৩] জীবনানন্দের উপলব্ধি রোমান্টিকতার নয়—বিপন্নতার, বিস্ময়ের :

বধূ শুয়ে ছিলো পাশে—শিশুটিও ছিলো ;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—জ্যোৎস্নায়,—তবু সে দেখিল
কোন ভূত ? ঘুম ভেঙে গেলো তার ?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।

বিস্ময়ের কারণ—প্রকৃতি-সংলগ্ন সকল প্রাণীই জীবনাকাঙ্ক্ষী :

তবুও তো প্যাঁচা জাগে ;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।
টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা ;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে !

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি ;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি।

তবু জাগতিক অর্থে পরিপূর্ণ মানুষ—যার প্রেম আছে—আশা আছে, সেই মানুষ আত্মহত্যা করে কেন ? জীবনে মানুষ প্রকৃতি-বিচ্যুত, মৃত্যুতেই প্রকৃতিতে বিলীনতা—এই উপলব্ধিতে ? কবির ভাষায় :

চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
একগাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা—একা ;
যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা
এই জেনে।

(কাব্য সম্ভার, পৃ. ১৮৬-৮৭)

কবির ধারণা : প্রকৃতির সব উপাদান—অশ্বত্থের শাখা, জোনাকির ভিড়, প্যাঁচা, যবের ঘ্রাণ, হেমন্ত বিকেল—এই আত্মহননের প্রতিবাদী ছিল। জীবন তবুও ছিল জীবনের ভারেই খুব ক্লান্ত :

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;

আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;
লাশকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই ;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছি টেবিলের প'রে।
("অশ্বত্থের শাখা", কাব্য সম্ভার, পৃ. ১৮৮-৮৯)

'সাতটি তারার তিমিরে'র "আকাশলীনা" কবিতায় প্রেম এক প্রৌঢ় মিনতির প্রতিধ্বনি। সুরঞ্জনাকে যুবকের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করার মধ্যে যে-ব্যাকুলতা, স্পষ্টতঃই তা বয়সের বিঘ্নে ব্যাকুল :

সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়োনাকো তুমি ;
বোলোনাকো কথা ওই যুবকের সাথে ;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা :
নক্ষত্রের রূপালি আগুন-ভরা রাতে ;

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে ;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার ;
দূর থেকে আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেয়োনাকো আর।

অন্যদিকে যুবকের প্রেম সুরঞ্জনার মৃত্তিকা-হৃদয়ে 'ঘাসের' মতই স্বাভাবিক, সতেজ :

কী কথা তাহার সাথে ? তার সাথে !

প্রথমে প্রশ্ন, তারপরই উপলব্ধির বিস্ময় :

আকাশের আড়ালে আকাশে
মৃত্তিকার মতো তুমি আজ :
তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে।

তাই উপসংহারে মেনে নেয়ার স্বাভাবিকত্ব :

সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস :
বাতাসের ওপারে বাতাস—
আকাশের ওপারে আকাশ।
(কাব্য সম্ভার, পৃ. ২৪৬)

জীবনানন্দ দাশের নগর-বিতৃষ্ণার অসামান্য কবিতা 'সাতটি তারার তিমিরে'-এর ''রাত্রি''। প্রতি দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে মিলযুক্ত চার চরণের আট স্তবকের কবিতার প্রথমেই নগরের কুশ্রী প্রত্যঙ্গ : এখানে হাইড্র্যান্ট ফেঁসে যায়, কুষ্ঠরোগী জল চেটে নেয় এবং সভ্যতার প্রতীক 'মোটরকার' 'গাড়লের মত' কেশে যায়, 'অস্থির পেট্রল ঝেড়ে'।

হাইড্র্যাণ্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল ;
অথবা সে-হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিলো ফেঁসে।
এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে
একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে
অস্থির পেট্রল ঝেড়ে ;

এই ঘটনার উপমা হিসেবে কবি যে অসাধারণ চরণ রচনা করেন তাও নগরের ভয়াবহতারই চিত্রকল্প :

সতত সতর্ক থেকে তবু
কেউ যেন ভয়াবহভাবে প'ড়ে গেছে জলে।

রাত্রির পরবর্তী দৃশ্য চাঞ্চল্যের ; পরাবাস্তবগন্ধী :

তিনটি রিক্শা ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে
মায়াবীর মতো যাদুবলে।

এই নগরে কবির কাজও 'হঠকারিতা'-উদ্ভূত :

আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে—হঠকারিতায়
মাইল-মাইল পথ হেঁটে—দেয়ালের পাশে
দাঁড়ালাম বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটে গিয়ে—টেরিটি বাজারে ;
চিনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে।

নগরের প্রাণ-স্পন্দন যন্ত্রোদ্ভূত—চতুর্থ স্তবকে তার চিত্র :

মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে।
কেরোসিন কাঠ, গালা, গুনচট, চামড়ার ঘ্রাণ
ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে
ধনুকের ছিলা রাখে টান।

পঞ্চম স্তবকে এরই প্রলম্বন : নাগরিক জীবনের 'টেনশনের' চিত্র ও চেতনা :

টান রাখে মৃত ও জাগ্রত পৃথিবীকে
টান রাখে জীবনের ধনুকের ছিলা।
শ্লোক আওড়ায়ে গেছে মৈত্রেয়ী কবে ;
রাজ্য জয় ক'রে গেছে অমর আত্তিলা।

ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তবকে এই নগরের আন্তর্জাতিক চারিত্র্য এবং গানের চরিত্রভ্রষ্টতা তীব্র-রেখায় ফুটে উঠেছে :

নিতান্ত নিজের সুরে তবুও তো উপরের জানালার থেকে
গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী ;
পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান—
আর কাকে, সোনা, তেল, কাগজের খনি।

ফিরিঙ্গি যুবক কটি চ'লে যায় ছিমছাম।
থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে ;
হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার ক'রে
বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।

কবিতার শেষ স্তবকের প্রথম দু'চরণে এই বৃদ্ধ নিগ্রোর চোখে নগরের 'মহৎ রাত্রির' স্বরূপ দর্শন এবং শেষ দু'চরণে পূর্ববর্তী দু'চরণে প্রতিষ্ঠিত 'জঙ্গলের' পশুর সঙ্গে নগরের 'জন্তু'-দের তন্তুজ পার্থক্য নির্দেশ—অসামান্য শ্লেষোত্থিত। নিগ্রোর চোখে :

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।

কবির চোখে :

তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

(কাব্য সম্ভার, পৃ. ২৫৯-৬০)

এই নগরেই কবি দেখেন

ভিখিরীকে একটি পয়সা দিতে ভাস্বর ভাদ্র-বৌ সকলে নারাজ।

("লঘু মুহূর্ত", কাব্য সম্ভার, পৃ. ২৬১)

এই অনাত্মীয় নগর, এই রাত্রি, এই বিংশ শতাব্দীর তিমির যতই অনিবার্য হোক কবি শেষ পর্যন্ত গেয়ে ওঠেন 'তিমির হননের গান'। প্রথমে সংশয় :

তিমিরহননে তবু অগ্রসর হ'য়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী ?

কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রত্যাশা ও প্রত্যয় :

আমরা তো তিমিরবিনাশী
হ'তে চাই।
আমরা তো তিমিরবিনাশী।

("তিমির হননের গান", কাব্য সম্ভার, পৃ. ২৮১)

কবি-জীবনের উদ্বোধনে জীবনানন্দ যেমন নজরুল-অনুসারী মানুষের জয়গান করেছিলেন, তেমনি যেন পূর্ণবৃত্তে ঘুরে এসে কবি-জীবনের উপসংহারে তিনি আবার জয়ধ্বনি করে ওঠেন জীবনের সম্ভাবনার, অরুণোদয়ের :

> সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চ'লে যেতে হয়
> কী কাজ করেছি আর কী কথা ভেবেছি।
> . . .　　. . .　　. . .
> নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন
> অমেয় চিন্তায় খ্যাত হ'য়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন
> হবে না কি মানবকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে!
> সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
> চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয় :
> জয় অস্তসূর্য, জয় অলখ অরুণোদয়, জয়।
> ("সময়ের কাছে", কাব্য সম্ভার, পৃ. ২৮৭-৮৯)

তথ্যনির্দেশ :

১ Dylan Thomas, 1951, Poetic Manifesto, first Published as interview in *The Texas Quarterly*, *Early Prose Writing* 1971, New York: New Directions.

২ ভারতচন্দ্র, ১৭৫২, অন্নদামঙ্গল, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ১৩৫০, 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী', তৃ-স. ১৩৬৯, পৃ. ৩০৩

৩ জীবনানন্দ দাশ, ১৯৫৬, কবিতার কথা, কলকাতা : সিগনেট প্রেস, পৃ. ৯

৪ জীবনানন্দ দাশ, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা : নাভানা ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৫ T. S. Eliot, 1920, Gerontion, Poems 1920, Collected Poems 1909-1962, *The Complete Poems and Plays of T. S. Eliot*, London : Faber and Faber, p. 37-38

৬ T. S. Eliot, 1921, The Waste Land, *The Complete Poems and Plays of* T. S. Eliot, P. 59--80

৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, ১৯৭০ সং, পৃ. ৫৪৮-৪৯

৮ তুলনীয় : কাজী নজরুল ইসলাম :

> "দূর দ্বীপবাসিনী চিনি তোমারে চিনি
> দারুচিনির দেশে তুমি বিদেশিনী গো
> সুমন্দভাষিণী।"—
> (নজরুল-গীতি (অখণ্ড), কলকাতা : হরফ প্রকাশনী, পৃ. ১০২)

৯ "কোন মহিলার চোখের আকার নিশ্চয়ই পাখির বাসার মতো হয়না, কিন্তু ক্লান্ত প্রাণের পক্ষে কখনো কোনো চোখ আশ্রয়ের নীড় হতে পারে।"—বুদ্ধদেব বসু, কালের পুতুল, পৃ. ৫৩

১০ জীবনানন্দ দাশের কাব্য সম্ভার, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৬, পৃ. ১৬৬
"হাজার বছর শুধু খেলা করে" শীর্ষক কবিতাটি কবি পরে নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্তন করেছেন :

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো :
চারিদিকে চিরদিন রাত্রির নিধান ;
বালির উপরে জ্যোৎস্না—দেবদারু ছায়া ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো : দ্বারকার ;—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।

(জীবনানন্দ দাশের কাব্য সম্ভার, ভূ. স. পৃ. ১৬৬)

এখানে প্রাচীন মিসরীয় উল্লেখের বদলে প্রাচীন ভারতীয় উল্লেখ ব্যবহৃত হয়েছে। বক্তব্যগত আবেদন খুব পরিবর্তন হয়নি।

১১ Geofrey Brereton, 1954, A short History of French Literature, London : Penguin Books, P. 310
১২ ঐ, পৃ. ৩১১
১৩ ডিলান টমাস, পূর্বোক্ত।
১৪ ঐ
১৫ ঐ
১৬ ঐ
১৭ ঐ
১৮ Brereton, Ibid, P. 311-12
১৯ দীপ্তি ত্রিপাঠী, ১৯৫৮, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, কলকাতা : নাভানা, পৃ. ১৯৪–২০০
২০ অশ্রুকুমার শিকদার, ১৩৮১, আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়, কলকাতা, পৃ. ১২১–২২
২১ আবদুল মান্নান সৈয়দ, শুদ্ধতম কবি, ঢাকা, নলেজ হোম, পৃ. তিয়াত্তর।
২২ দীপ্তি ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত।
২৩ ডিলান টমাস, পূর্বোক্ত।
২৪ মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ১৮৬২, বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্থ সর্গ : দশরথের প্রতি কেকয়ী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, মধুসূদন কাব্য গ্রন্থাবলী, ১৯৭০, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন, পৃ. ৪৩২–৩৭
২৫ দীপ্তি ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭
২৬ W. B. Yeats, *He Reproves the Curlew*, The Collected Poems of W. B. Yeats, 1933, Reprint—1971, Macmillan London Ltd., P. 69
২৭ W. B. Yeats, *The Scholar*, Ibid, P. 158
২৮ অশ্রুকুমার শিকদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২

২৯ W. B. Yeats, *The Second Coming*, Ibid, p. 210-11
৩০ অনুবাদ : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ১৯৮৪, সঙ্গী বিহঙ্গী, ঢাকা : কবিতা সংসদ পৃ. ১৩ দ্রষ্টব্য।
৩১ বুদ্ধদেব বসু, ১৩৫৩, কালের পুতুল, কলকাতা : কবিতা ভবন, পৃ. ৫২
৩২ তুলনীয় : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, "শাশ্বতী", অর্কেস্ট্রা, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ, ভারবি, ১৯৬৬, পৃ. ৫০-৫১
৩৩ স্মরণীয় : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, "মহানিশা", উত্তরফাল্গুনী, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ১৫৭-৫৯

গ্রন্থপঞ্জি

মূল-গ্রন্থ

জীবনানন্দ দাশ, ১৩৭৬, জীবনানন্দ দাশের কাব্য সম্ভার, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৬; ঐ, পরিবর্ধিত তৃ-স. ১৩৭৯, রণেশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত, ঢাকা : খান ব্রাদার্স এন্ড কোং
জীবনানন্দ দাশ, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা : নাভানা
জীবনানন্দ দাশ, ১৯৫৬, কবিতার কথা, কলকাতা : সিগনেট প্রেস

সহায়ক-গ্রন্থ

অশ্রুকুমার শিকদার, ১৩৮১, আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়, কলকাতা
আবদুল মান্নান সৈয়দ, শুদ্ধতম কবি, ঢাকা : নলেজ হোম
কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল-গীতি (অখণ্ড), কলকাতা : হরফ প্রকাশনী
দীপ্তি ত্রিপাঠী, ১৯৫৮, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, কলকাতা : নাভানা
বুদ্ধদেব বসু, ১৩৫৩, কালের পুতুল, কলকাতা : কবিতা ভবন
ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর, ১৭৫২, অন্নদামঙ্গল কাব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ১৩৫০, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, তৃ-স. ১৩৬৯, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ১৯৬২, বীরাঙ্গনা কাব্য, মধুসূদন কাব্য গ্রন্থাবলী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, ১৯৭০, ঢাকা : বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৭০ সংস্করণ
Geofrey Brereton, 1954, *A Short History of French Literature*, London ; Penguin Books

T. S. Eliot, 1969, *The Complete Poems and Plays of T. S. Eliot*, London : Faber and Faber

T. S. Eliot, 1920, *The Sacred Wood*, London, Methuen & Co. Ltd.

T. S. Eliot, Dylan Thomas, 1971, *Early Prose Writings*, New York : New Directions.

W. B. Yeats, *Selected Poems*, London : Faber and Faber